ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 AUG 1988 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন ও শিক্ষার পরিবেশ

অধ্যক্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঢাকায়। সারাদেশের সরকারী-বেসরকারীসহ সকল ধরনের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের সমাবেশ ঘটেছে এই সম্মেলনে। এছাড়া শিক্ষাবিভাগের পদস্থ কর্মকর্তারাও ছিলেন।

এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের উদ্যোগে এই সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী নিজেও উপস্থিত ছিলেন সর্বক্ষণ। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা। মূল পত্রের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আলোচনার সঙ্গে ছিল মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা। আলোচনায় অনেকেই অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলেন, নির্দেশমূলক ওয়ার্কিং-পেপার সঙ্গেই ছিল কিন্তু দ্রুত ধাবমান সময়ের অসহযোগিতার কাছে উদ্যোক্তাগণ ছিলেন নিরুপায়। কথা বলার সুযোগ অধিকাংশ অধ্যক্ষ পাননি—যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেননি। তবু এর মধ্য দিয়েই সংকট কিঞ্চিৎ চিহ্নিত হতে পেরেছে; সমাধানের ছায়া ছায়া আভাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে; নিজ নিজ পরিমন্ডলে কেউই এককভাবে জর্জরিত নন, সমস্যা জড়িয়ে আছে সামগ্রিকভাবে—এ বোধ নতুন করে ধরা দেয়ায় প্রশান্তি না জুটলেও মনের অশান্তি লাঘবে সহায়ক হয়েছে।

উত্থাপিত তথ্য সবই যে নতুন এমন কথা বলা যাবে না, তবে অন্যের কাছে শুনতে পেলে, নিজের মতের সঙ্গে মিলে গেলে স্বস্তি পাওয়া যায়। দুঃখের মধ্য দিয়ে একাত্ম হওয়া যত সহজ, তেমন আর কিছুতে নয়।

আজকের দিনে শিক্ষার জন্য মমতা কমে গেছে, এই বহুল উচ্চারিত তথ্যটি সর্বাংশে সত্য নয়। আজকের দিনে অভিভাবক সন্তানের শিক্ষার জন্য যে সময়, শ্রম, শক্তি, চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ব্যয় করেন মাত্র কিছুকাল আগেও অভিভাবকরা তা করতেন না। বিদ্যাপীঠ থেকে বয়ে-আনা বাড়ির কাজের ঝুড়ির ভার নামাতে গৃহশিক্ষক দূরের কথা, বাড়ির সদস্যদেরও দরকার হত না। আজকের অভিভাবক সন্তানের পাঠের জন্য নিজেদের অবকাশের আনন্দ বিসর্জন নিচ্ছেন; দুপুর, বিকেল সন্ধ্যায় সন্তানের পাঠের সঙ্গী হচ্ছেন প্রয়োজনে উপবাস নিজেও নিচ্ছেন।

তবুও লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না কেন, সেটাই প্রশ্ন। বাধাটা কোথায়? সন্তানের জন্য ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবাই চায়, পায় না। ভর্তি-সংকট সর্বত্র সর্বস্তরে [illegible] কেবল ধরনে ভিন্ন। জনসংখ্যা বাড়ছে, সে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ছে না, এ পুরোপুরি সত্য বলা যাবে না। ছোট ছোট অনেক স্কুল, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোথাও অষ্টম শ্রেণী অবধি। এমন কি নবম, দশম মানে [illegible] শিক্ষার্থী ভর্তি ও পাঠদান [illegible] শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি নেই [illegible] অন্য স্কুলের প্রার্থীদের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠানো হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে? তাদের মাধ্যমেই ফর্ম পূরণ করানো হয়। ব্যাপারটি তো রাখা ঢাকা নয়।

কেবল পরীক্ষার কেন্দ্র বা পরীক্ষার পদ্ধতি নয়, সে তো পাঠ-প্রক্রিয়ায় অনেক পরের ব্যাপার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, অবস্থান, রূপরেখা, দর্শন এসব আগে আসে বলে এগুলো প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে প্রস্তুত না করে এবং প্রস্তুতির জন্য উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ মানসিক পাঠমুখী এবং জ্ঞান অন্বেষী না করে তাদের শূন্য হাতে এবং সর্বোপরি শূন্যমনে পরীক্ষার হলে পাঠালে যা ঘটার, তা ঘটবেই—তাকে প্রহরা দিয়ে, বহিষ্কার করে খাতা খানিক আটকে রেখে রোধ করার উপায় নেই—উপায় নেই পরীক্ষার পর লাল-হলুদ চিহ্ন দিয়ে তাদের উত্তরপত্র অবমূল্যায়িত করেও। দুর্নীতি ধৃত অংশেরও যদি হয়, ঢালাওভাবে সকলকে দায়ী করা সমীচীন নয়।

শিক্ষা দান ও 'শিক্ষা' বিষয়টিই এখন পণ্যের মতো। টাকা দিয়েই এর মূল্যায়ন টাকা দিয়েই এর অর্জন। মূল্যবান বস্তুও অর্থের মূল্যে করায়ত্ত হয় কিন্তু তার নিজগুণেই তা অমূল্যই থেকে যায়; দুঃখ এই—অমূল্য শিক্ষা চড়া মূল্যে বিকিকিনি হয়ে মূল্য চিরতরে হারায়। এর জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নন। দু'চারটে বিষয় কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়। যেমন স্কুলে নবম শ্রেণীতে নাম নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) প্রথা প্রচলন। আগে এ প্রথা কলেজ জীবনের শুরুতে ছিল। স্কুলেই এই প্রচলনের উদ্দেশ্য—'ছাত্রছাত্রী সংখ্যা' নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী হওয়া নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বাস্তবে তা কতটা সফল করা গেছে, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাই একে একে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে অনেক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল: যেমন নবম ও একাদশ শ্রেণীতে নিবন্ধীকরণের পর শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ বদলিপত্র প্রদান ও ভর্তি নিষিদ্ধকরণ। এর মধ্যে ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে। দেশের সকল স্কুল-কলেজে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় সেন্টআপ করার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা নিয়ে বাছাইয়ের যে সুপ্রাচীন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কালের চাকায় তা গুঁড়িয়ে গেছে। এখন মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠান সাহসী হয়ে নির্বাচনী পরীক্ষা নেন এবং অনুত্তীর্ণদের অনির্বাচিত ঘোষণা করেন। বিপর্যয় তখনই বাধে—কারণ ফর্ম পূরণ করতেই হবে—বছর ভরে ছাত্রছাত্রী আসেনি, পড়েনি, পাস করেনি—এজাতীয় আলোচনা বাজে। ফলে সংঘর্ষ হয়, তিক্ততা হয়। সব শেষে হয়তো কিছু ক্ষেত্রে আপোস করতেই হয় বাকিরা যারা মামার জোরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে নতি

দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 AUG 1988 পৃষ্ঠা কলাম

স্বীকার করতে পারলেন না—তারা প্রতিষ্ঠান বদলে সন্তান-সন্ততিকে পরীক্ষা দেয়ানোর ব্যবস্থা করেই ছাড়েন। এরই জন্য অন্তরায় সৃষ্টি হল দু'পর্যায়ে: প্রথমে বদলিপত্র ও ভর্তি নিষিদ্ধ হল দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে। সেক্ষেত্রে দেখা গেল শিক্ষার্থী নবম শ্রেণী বা একাদশ শ্রেণীতে অনুত্তীর্ণ বা উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যৎ আঁচ করে অগ্রিম টিসি নিয়ে চলে যায় অপেক্ষাকৃত উদার প্রতিষ্ঠানে। এই প্রথা বন্ধ করার জন্য নিয়ম হল: নবম ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্য শেষ হলে ভর্তি তারিখ পরে ভর্তিকৃতদের তালিকা বোর্ডে পাঠাতে হবে—তারপর নাম রেজিস্ট্রেশন হলে তো বটেই। যাতে করে পরে ছাত্রসংখ্যা আকস্মিক স্ফীতি ধরা পড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হত পারে।

এ পর্যায়েও সফলতা সুদূরে দেখা গেল কারণ ঐ সমঝোতা। যার গুণে চমৎকারভাবে পত্রের তারিখ নম্বর ঠিক রেখে সংযুক্ত তালিকা রি-প্লেস করে দেয়া যায় এবং নির্বাচন-উত্তর শিক্ষার্থীর তথা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায়। এর পর নিয়ম হল নিবন্ধীকরণের পরেই বদলির সুযোগ থাকবে না। তাতেও 'ব্যাক-ডেট' জাদুর মতো কার্যকর হয়ে উঠলো দেখে নিয়মহল কলেজ পর্যায়ে ভর্তির সময় মূল নম্বর পত্র ও মূল প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে—যা শিক্ষার্থী ফেরত পাবে কোর্স শেষে অর্থাৎ যে মূল নম্বরপত্র ও মূল প্রশংসাপত্র যে কোনও ভর্তির সময় অনিবার্য দলিলের কাজ করে, তাই আবদ্ধ করে রাখা হল প্রতিষ্ঠানের প্রকোষ্ঠে। কিন্তু সেও বেশী দিন আটকে থাকে না লোহার সিন্দুকে।

অভিযোগ ওঠে—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অসাধুতা এবং শিক্ষকদের বাণিজ্যিক মানসিকতা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় দেশ থেকে আজ সুশিক্ষা ও শিক্ষার শুভ পরিবেশ নির্বাসিত। অভিযোগ অসত্য, এমন কথা বলার পথ নেই কেননা প্রতিষ্ঠানের একাডেমীক পরিস্থিতি নাজুক হলে সে দায়িত্ব অস্বীকার করা অর্থহীন। কিন্তু প্রশ্ন—যে প্রতিষ্ঠান নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা শেষ মুহূর্তে বাড়িয়ে দেয়, সে প্রতিষ্ঠান ব্যাক ডেট-এর কল্যাণে অনেক অসমীচীন কাজ করে তা থেকে পরিত্রাণ পায় কী করে? কেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দফতরে বা বোর্ডে ধরা পড়ে না? পড়ার তো কথাই।

বিষয়টি বিতর্কের নয় বিশ্লেষণের। যে বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসবে—কোনও অনিয়মই একক তাগিদে সম্পন্ন করা সহজ নয়। তাই এ কারণে পরস্পরকে দোষারোপ না করে সমন্বিত ভাবে ফাঁকির পথ বন্ধ করার পথ খোঁজাই কল্যাণের। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক যখন—চোরাপথ রুদ্ধ করা কি তখন কঠিন?

অর্থাৎ নিয়ম যখন তৈরি হয়, সে নিয়ম যদি অসদুপায় অবলম্বনের সহজ পথের প্রতিবন্ধক হয়, তখন নিয়ম নীতি প্রবর্তনকারীদের ওপর যে আক্রোশ বা ক্রোধ—তা পড়ে নিয়ম পালনকারী ব্যক্তিদের ঘাড়ে। এর ফলে যে শংকা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, সবশেষে মারাত্মক কিছু না ঘটলেও। তা কি মেনে নেয়া যায়? এতো টেনসন এতো অবমাননা কি পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে প্রেরণা জোগায়? সর্বক্ষণ অগ্নিবলয়ে অবস্থান কি শিক্ষার শুভ পরিবেশ বিঘ্নিত করার জন্য যথেষ্ট নয়?

এ জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যেতে হবে। পরিবেশ কারও একার হাতে নেই—না শিক্ষার্থীর, না শিক্ষকের, না অভিভাবকের, না শিক্ষা কর্মকর্তার। পৃথকভাবে সকলে অসহায়, ঐক্য হলেই জয়, একতা-ই সফলতা।

[illegible] উচ্চারিত হয়েছে।

সবশেষে আমরা অধ্যক্ষ সম্মেলনের শিক্ষার পরিবেশ ও পরীক্ষা ব্যবস্থা শীর্ষক মূল পত্র উপস্থাপক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশার সঙ্গে একমত হলে শিক্ষার পরিবেশ কলুষমুক্ত করা সম্পর্কে তার উপসংহারের উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'ক্রম বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকির সম্মুখীন আমাদের এই দেশের অস্তিত্বের জন্য এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আমাদের সামনে আর কোনও বিকল্প নেই।'

আমরাও এই মতের প্রতিধ্বনি করতে চাই।

—হোসনে আরা শাহেদ